বিশ্বসভ্যতা

ইউনিট ২

আদিম যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। এই ছিল তাদের খাদ্য। এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। সে সময় পাথরই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। সে কারণে এ যুগকে পাথরের যুগ বলা হয়। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত। এরা আগুনের ব্যবহারও জানত।

পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখে, একই সঙ্গে শেষ হয় তার যাযাবর জীবন। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এযুগে মানুষ নদীর তীরে তীরে বসবাস শুরু করে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানব সভ্যতার শুরু। এই ইউনিটে কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই সত্য কাহিনী, যাকে আমরা বলি ইতিহাস– সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যে সভ্যতাগুলো থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানা যায় এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সম্পর্কে এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: মিশরীয় সভ্যতা, মোসোপটেমীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, চীন সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ ঃ মিশরীয় সভ্যতা	পাঠ-২.২ ঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতা
পাঠ-২.৩ ঃ সিন্ধু সভ্যতা	পাঠ-২.৪ ঃ চিন সভ্যতা
পাঠ-২.৫ ঃ গ্রিক সভ্যতা	পাঠ-২.৬ ঃ রোমান সভ্যতা

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

পাঠ-২.১ মিশরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- নীলনদের অবদান, প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিশ্বসভ্যতা বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	খ্রিস্টপূর্ব, ঐতিহাসিক যুগ, হায়ারোগ্লিফিক, নরপতি, ফারাও, মমি, পিরামিড, প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা, নোম, 'পের-ও', নারমার, মেনেস

পটভূমি

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিস্তৃতিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ পর্যন্ত। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ যা আমাদের কাছে পরিচিত ইজিপ্ট বা মিশর নামে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। যার একটি ছিল উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) অপরটি ছিল দক্ষিণ মিশর (উচ্চ মিশর)। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়ে নীলনদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলে

পরিচিত। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে। তখন থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে 'নারমার' বা 'মেনেস' একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত হন। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে।

সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান

বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

রাষ্ট্র ও সমাজ

প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'নোম' বলা হতো। মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও-এর (মেনেস বা নারমার) অধিনে ঐক্যবদ্ধ মিশরের রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেম্ফিস। মিশরীয় 'পের-ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারওরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার বংশধর মনে করতেন। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে ফারাও। পেশার উপর ভিত্তি করে মিশরের সমাজের মানুষকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন: রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস।

মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষি নির্ভর। নীল নদের তীরে গড়ে তোলা সভ্যতার মানুষ অর্থাৎ মিশরীয়রা বন্যার সময় বাঁধ তৈরি করে ফসল রক্ষা করত। আবার শুষ্ক মৌসমে ফসলের ক্ষেতে পানি দেয়ার জন্য খাল কেটে গড়ে তুলেছিল সেচ ব্যবস্থা। মিশরেই প্রথম সরকারি ব্যবস্থায় চাষাবাদ চালু হয়। কৃষিনির্ভর মিশরের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করতো।

নীল নদ:

মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক 'হেরোডোটাস' যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীল নদের দান।' নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীন কালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস

সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

পিরামিড

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মমি। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতদেরও তাঁরা নিয়োগ করতেন।

শিল্প

মিশরের চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। মিশরীয়দের চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের চিত্রশিল্পের সূচনা হয় সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে।

কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকর্ম স্ফিংকস

ভাস্কর্য

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে-অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য, মানুষ অথবা জীবজন্তু সবই ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতদার্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গির্জার অতুলনীয় স্ফিংকস। স্ফিংকস হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার

মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক' বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের মন্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। পরে এই কাগজের উপর তারা লিখতে শুরু করে। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। যে শব্দ থেকে ইংরেজি 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়, যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। এতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল; যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

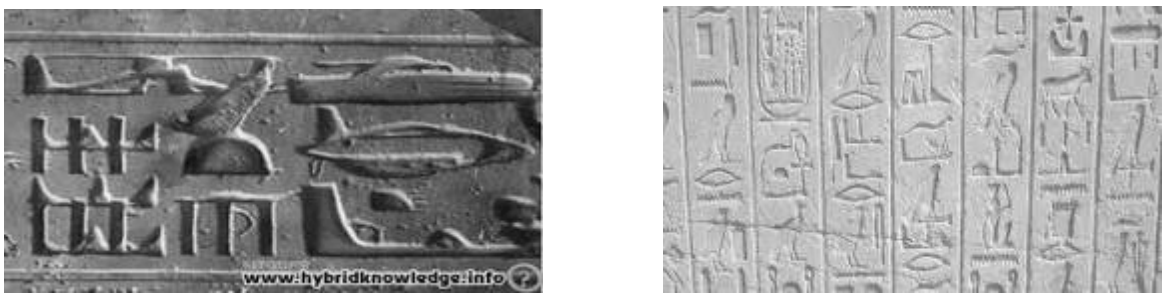

লিখন পদ্ধতি বা হায়ারোগ্লিফিক

বিজ্ঞান

মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্যতা, পানি প্রবাহের মাপ জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অংক শাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। ফলে এ দুটি বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। তারা অংক শাস্ত্রের দুটি শাখা– জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি আবিষ্কার করে। ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিন্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত। চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশরীয়রাই সর্বপ্রথম 'মেটেরিয়া মেডিকা' বা ঔষুধের তালিকা প্রণয়নে সক্ষম হয়। মিশরীয়রা দর্শন, সাহিত্য চর্চাও করত। তাদের রচনায় দুঃখ হতাশার কোন প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মানব সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদানের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন মিশরীয়রা মানব সভ্যতার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রকলায় আছে বিশেষ বৈচিত্রপূর্ণ অবদান। লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থা চালু, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র অংক শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। যে কারণে মানব জাতি এখনও মিশরীয়দের কাছে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মিশরীয়রা ব্যঞ্জনবর্ণের কয়টি বর্ণ আবিষ্কার করে?
(ক) ১১ টি (খ) ৩৯ টি
(গ) ২৪ টি (ঘ) ২৩ টি

২। হায়ারোগ্লিফিক কী?
(ক) মিশরীয় চিত্র লিপি (খ) চীনের লিপি
(গ) গ্রিক লিপি (ঘ) রোমান লিপি

৩। মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করে রাখত কেন? (অনুধাবণ)
(ক) দেহকে জীবিত করার জন্য (খ) দেহকে কবর দেওয়ার জন্য
(গ) দেহ সৎকারের জন্য (ঘ) দেহকে তাজা রাখার জন্য

৪। মিশরের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠে–
i) বন্যায় বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষা করার মাধ্যমে ii) শুষ্ক মৌসুমে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলায়
iii) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-২.২ মেসোপটেমীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাগুলোর নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নগর সভ্যতা, সেচ ব্যবস্থা, উর্বরভূমি, বেদুইন, মন্দির, আইনের শাসন, মরুভূমি।

মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান

খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দে মিশরে যখন নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সময় আরো কিছু নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই নগর সভ্যতাগুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকলেও, একই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠার কারণে এদেরকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়। বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যেই প্রাচীন মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়া একটি গ্রিক শব্দ। যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমীয়া বলতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বোঝায়। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরুভূমি; দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়ার অর্ন্তভুক্ত সভ্যতাসমূহ

প্রাচীন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন: সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালডীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা।

নগর সভ্যতার উত্থান

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,৫০০ অব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমীয়ার অধিবাসীরা ইউফ্রেতিস নদীর পানির প্রবাহ পরিবর্তন করে এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করতে শেখে। মেসোপটেমীয়ায় কৃষি কাজের জন্য এ ধরনের সেচ ব্যবস্থার খুবই দরকার ছিল। কারণ এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম হতো। আস্তে আস্তে ঐ অঞ্চলবাসীরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টির পানির চেয়ে, সেচের পানি চাষের জন্য বেশি উপযোগী এবং উপকারী। এতে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রচুর ফসল ফলতে থাকে। ফলে কিছু মানুষের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। পরবর্তীকালে এরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসক বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করেই নগরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর ভিত গড়ে উঠতে থাকে।

মেসোপটেমীয় সভ্যতার নিদর্শন

মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য

উর্বর ভূমি হওয়ার কারণে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির কাছে বসবাসের জন্য মেসোপটেমীয়া ছিল আকর্ষণীয় ভূ-খণ্ড। তাছাড়া ভৌগোলিকভাবে অরক্ষিত হওয়ার কারণেও বিদেশীদের আগমন এবং আক্রমণ দুইই ছিল সহজ ব্যাপার। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ মেসোপটেমীয়ার উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আবার দক্ষিণে অবস্থিত আরব মরুভূমি থেকে মরু বেদুইনরাও মেসোপটেমীয়া আক্রমণের চেষ্টা করেছে। মেসোপটেমীয়া মিশরের মতো কোনো একজন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। মন্দিরের প্রাচুর্য ও অবস্থান দেখে ধারণা করা হয় যে, এই অঞ্চলের মানুষ মন্দিরের বেধে দেয়া নিয়ম ও শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকতো। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হতো মন্দিরের নির্দেশ মতো। এ কারণে দেখা যায় যে, মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনায় পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। মেসোপটেমীয়ায় আইনের শাসন যেমন ছিল কঠোর, শাস্তির বিধানও ছিল তেমন কঠিন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মেসোপটেমীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মেসোপটেমীয় সভ্যতার জন্ম টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস দুই নদীর মধ্যবর্তী উর্বর সমতল অঞ্চলে। এই অঞ্চল আরো পাঁচটি সভ্যতার জন্মস্থান। যে সভ্যতাগুলো বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বর্তমান কোন রাষ্ট্রের সীমানায় মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত ছিল?
(ক) মিশর (খ) সিরিয়া
(গ) ইরাক (ঘ) ইরান

২। মেসোপটেমীয়া কোন ভাষার শব্দ?
(ক) গ্রিক (খ) চাইনিজ
(গ) সংস্কৃত (ঘ) আরবি

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন–

ক নামক দেশটি কোন একক রাজার শাসনাধীন ছিল না। বিদেশীরা প্রায়ই আক্রমণ করতো এবং দেশটিতে প্রবেশ করতো। উপরন্তু সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মেনে চলতে সকলে বাধ্য ছিল।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থায় কোন সভ্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে?
(ক) রোমান (খ) গ্রিক
(গ) মেসোপটেমীয় (ঘ) মিশরীয়

৪। উক্ত সভ্যতায় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মানতে হতো?
(ক) মন্দির (খ) মসজিদ
(গ) গীর্জা (ঘ) প্যাগোডা

পাঠ-২.৩ সিন্ধু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন;
- মানব সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হরপ্পা সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ববিদ, আর্যজাতি, নগরদুর্গ, মাতৃতান্ত্রিক, মাতৃপূজা, পোড়ামাটি।

পটভূমি

সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোতে এবং দয়ারাম সাহানীর চেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারী জেলার হরপ্পায় এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নিদর্শন আবিষ্কার করে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় অঞ্চল একই সভ্যতার অন্তর্গত। সিন্ধু সভ্যতা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

ভৌগোলিক অবস্থান

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা হলেও এর বিস্তৃতি ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদীর অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

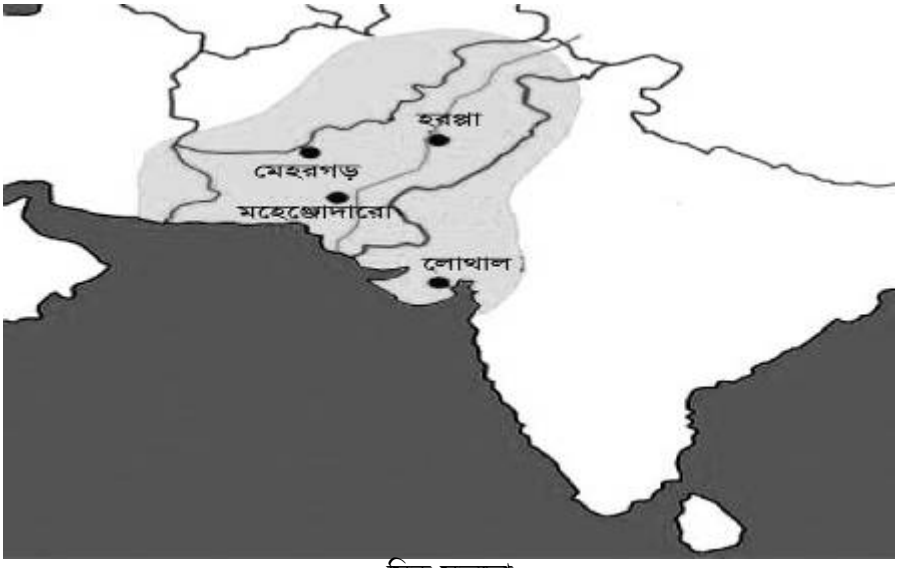

সিন্ধু সভ্যতা

সময়কাল

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অথবা ১৪০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটে। তবে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এই সভ্যতার সময়কাল মর্টিমার হুইলারের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিস্টপর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক ও সামজিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসন প্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শহরের এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত নগর দুর্গগুলো দেখে মনে হয় নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতো। চারদিক প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে প্রশাসনিক বাড়িঘরের অবস্থাও দেখা যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো দুই নগরের নগর পরিকল্পনা ছিল প্রায় এক। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ সুবিধা পেত না। সমাজ ধনি ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকেরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধনি এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মহিলারা খুবই সৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, বালা, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্দ, চুড়ি, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। সমাজে পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। তাছাড়া অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন ও বাণিজ্য। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্প পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তবে, তাদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দির, উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির অসংখ্য নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, তারা ঐ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশুপাখির উপাসনাও করত। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার তার কবরে রেখে দিত।

নগর পরিকল্পনা

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটি পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর দুটো প্রায় একই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতায় অবস্থিত এই বড় নগর দুটো ছাড়াও অন্যান্য সব শহরের ঘরবাড়ি সবই পোড়া মাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। নগরির ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট। নিরাপত্তার জন্য

প্রয়োজনীয় সৈন্য শহরগুলোতে মোতায়েন থাকত। এক বাক্যে বলা যায়, সিন্ধু সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত ছিল।

পরিমাপ পদ্ধতি

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।

শিল্প

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরি করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকার নির্মাণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে এবং হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই তিন তলার ঘরের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যে মিলনায়তনটির ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিরাট এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী।

বৃহৎ স্নানাগার

ভাস্কর্য শিল্পেও সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের দক্ষতা ছিল। পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরের তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারী মূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো। তবে সিলগুলোর লেখা এখনও পড়ে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লেখা পড়া জানতো।

সীল মোহর

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. ভারত পাকিস্তানের যেসব অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার দেশ ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করুন। ২. সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের কোন কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল?

সারসংক্ষেপ

সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতার মূল অঞ্চল পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুর মহেঞ্জোদারো হলেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে পাকিস্তান ভারতের আরো কিছু কিছু অঞ্চলে। সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও, এরা আধুনিক কালের মতো উন্নততর নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তবে এরা লোহার ব্যবহার জানত না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিন্ধু সভ্যতায় সমাজ কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল? (জ্ঞান)
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। সিন্ধু সভ্যতার রাস্তাগুলো কেমন ছিল? (অনুধাবন)
(ক) সরু (খ) চওড়া
(গ) সোজা (ঘ) আঁকাবাঁকা

৩। Y সভ্যতার অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। Y সভ্যতার সাথে কোন সভ্যতার মিল লক্ষণীয়–
(ক) মেসোপটেমীয় (খ) সিন্ধু
(গ) গ্রিক (ঘ) মিশরীয়

৪। মর্টিমার হুইলারের মতে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ (খ) খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ
(গ) খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৪০০ অব্দ (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১৩০০ অব্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাসাইল গ্রামের জোতদার লেবু মিয়া তার বাড়ির আঙিনায় গোসলের জন্য কুয়া খনন করে চারদিকটা ইট দিয়ে পাকা করে দেন। একই সাথে ধান মাপার জন্য বিশেষ ধরনের ওজন মাপার পাথর তৈরি করে দিয়েছিলেন। এতে ফসলের ওজন করা হয়েছিল সহজ, অপরদিকে আধুনিক জীবনের সন্ধানও তিনি দিয়েছিলেন।
ক. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম কী?
খ. সিন্ধু সভ্যতাকে নগর সভ্যতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে লেবু মিয়ার তৈরি ব্যবস্থা পাঠ্য বইয়ের কোন সভ্যতার তৈরি ব্যবস্থার সাথে মিল দেখা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. 'উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক' যাতে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে – আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-২.৪ চিন সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চিন সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থানের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- চিনের আদি মানুষ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সভ্যতায় চৌ-যুগের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রাগৈতিহাসিক, পিকিং মানুষ, নবোপলীয়যুগ, আইডিও গ্রাফ, লৌহযুগ, এ্যানিমেল ম্যান, মহাপ্রাচীর,

চিনা সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থান

চিনের প্রাচীন সভ্যতা একমাত্র সভ্যতা যা কোনো সময় পুরোপুরি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত চিন তার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এককথায় চিনা সভ্যতা পৃথিবীতে বিরাজমান সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা। ভৌগোলিক কারণে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকায় এ অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নিজস্ব নিয়মে, ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। চিন পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। দেশটির তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং জেকিয়াং নদীর তীরে, তৃতীয়টি দক্ষিণ চিনের ভূখণ্ডে। এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল- শাং ও চৌ রাজাদের আমলে।

দেশটির সীমান্ত জুড়ে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার কারণে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না। চীনের উত্তর দিকে গোবি মরুভূমি, পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল। নদীগুলোর প্রভাবে প্রাচীন চিনে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যে কারণে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা সহজ ছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চিনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল।

চিনের আদি মানুষ

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চিনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। চিনের রাজধানী পিকিং-এর (বর্তমান বেইজিং) কাছে এই খুলি পাওয়া যায়। এরাই চিনের আদিম মানুষ; যাদেরকে 'পিকিং মানুষ' বলা হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে নবোপলীয় যুগ বা নতুন পাথরের যুগে চীনে মানুষের বসবাস ছিল। চিনের আদিবাসিরা হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর দুই পাড়েই বাস করত। পরে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক অংশ চাষাবাদ করতো, অপর অংশটি যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। যে অংশটি নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করে ধীরে ধীরে সভ্য জাতিতে পরিণত হতে থাকে। এরা কৃষিকাজের পাশাপাশি পশু পালনও করতো। এরাই প্রাচীন চীনা সভ্যতার স্রষ্টা। এই সভ্যতার স্রষ্টাদের রেশমের কাপড়, চাকাযুক্ত গাড়ি, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার বিদ্যা জানা ছিল। তারা কৃষি কাজের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করত। কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য তারা খাল কেটে নদী থেকে জমিতে পানি সরবরাহ করত। চীনের আদি মানুষরা নগর নির্মাণ করে উঁচু দেয়াল দিয়ে তাকে সুরক্ষিত রাখত, যাতে যাযাবরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরা এক ধরণের দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল।

শাং রাজাদের যুগ (১৭৬৬-১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ধারণা করা হয় প্রায় চার হাজার বছর আগে চিনে নগর সভ্যতা গড়ে উঠে ছিল। হুয়াংতি নামের একজন শক্তিশালী শাসক হোয়াংহো নদীর তীরে এক বড় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এই হোয়াংহো নদী তীরেই শাং রাজারা যে সভ্যতা গড়ে তোলেন, তা অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। বেশ কয়েকটি রাজবংশ চিনের সভ্যতা গড়ে তুলে ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে

পুরোনো ছিল শাং বংশ। শাং রাজাদের যুগে ব্রোঞ্জের জিনিস পত্রের বেশি ব্যবহার হতো বলে এ যুগের সংস্কৃতি ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

সভ্যতায় শাংযুগের অবদান

শাংযুগের মানুষের মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাসস্থান

শাংযুগে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। ফসলের মধ্যে গম, যবই বেশি চাষ হতো। কিছু কিছু জমিতে ধানেরও চাষ হতো। এ যুগের মানুষের মধ্যে পশু পালনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। গ্রামের মানুষরা মাটির ঘরে বাস করত। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের ছাদকে নলখাগড়ার ওপর কাদার আবরণ দিয়ে ছাওয়া হতো। সে সময়ে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করত। শহরের ঘরবাড়ি ছিল চমৎকার। ঘরগুলো হতো আয়তকার। ঘরের ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণ আকৃতির। শাং সমাজে কারিগর বা শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভূমিদাস এবং দাসেরা সমাজের সব অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করত। এদের বেশিরভাগ ছিল কৃষক। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরা গুটিপোকার চাষ করত। এই গুটি পোকা থেকে সূতা বের করে মসৃণ কাপড় বোনা হতো। পরবর্তিকালের সম্রাটদের সময়ে এই মসৃণ সিল্ক চিনের একটি প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রশিল্প

বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র, ছুরি, কুঠার ইত্যাদি। শাং যুগের কারিগররা হাড়, ঝিনুক, শিং এসব দিয়েও সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করতে পারতো। তারা হাতির দাঁত দিয়ে বিলাসী দ্রব্য তৈরিতে দক্ষ ছিল। শাং যুগের নানা ধরনের মাটির পাত্র, চীনের বিখ্যাত চিনামাটির পাত্রের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। তাছাড়া তীর, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, মুখোশ প্রভৃতি তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

লিখন পদ্ধতি

চিনে ভিন্ন ধরনের একটি লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই লিখন পদ্ধতিকে বলা হয় আইডিওগ্রাফ। এ লেখা গুলো দেখতে অনেকটা চিত্র লিপির মতো ছিল। লেখার জন্য তৈরি হয় কালি আর তুলি। শাং লিপিকাররা রেশমি কাপড়ের উপর লিখতেন। এ লেখার পদ্ধতি উদ্ভবের পেছনে কারণ ছিল রাজার আদেশ ও পুরোহিতের বাণী প্রচার।

ধর্মীয় ক্ষেত্র

রাজকার্য ছাড়াও ধর্মীয় বিষয়ে শাংরাজাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। রাজার নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। শাং যুগের প্রধান দেবতার নাম ছিল শাংতি। মৃত রাজাকেও কখনও কখনও পূজা করা হতো। তাই রাজার সমাধিসৌধ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হতো। শাং যুগের মানুষ মাটি, বাতাস, নদী, বিভিন্ন দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ) এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করতো।

চৌ রাজাদের যুগ (১০২৭-২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

শাং রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চৌ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে চৌ রাজারা ছিলেন শাংদের অধীনস্থ মিত্র। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব এগারো শতকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চৌরা শাং রাজবংশকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে।

সভ্যতায় চৌযুগের অবদান

চৌ রাজারা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ক্ষমতা দখল করে প্রায় ৮০০ বছর গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করে। সে সময়ের মধ্যে তারা চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সাফল্যের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব সভ্যতায় তাদের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক

পেশার দিক থেকে প্রথম থেকেই চৌ বংশের লোকেরা ছিল কৃষক। তাদের শাসন কালেও তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। তারা খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। চৌ-রা কৃষি কাজে পশু ব্যবহার করত। চৌ শাসন আমলে চীনের সভ্যতা নতুন পাথরে যুগ থেকে লৌহ যুগে প্রবেশ করে। তারা লোহার ব্যবহার শেখে। লোহার ফলাযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে সে সময় প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো।

চৌ-জাতিরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। এরা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বড় বড় শহর গড়ে তোলে। শহরের বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য এবং মালপত্র বহনের লক্ষ্যে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ ও খাল খনন করা হয় তা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে। এসময় চীনা বণিকদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ হয়। বণিকরা গাধা, উটের সাহায্যে মালামাল পরিবহণ করতো। শস্য, লবণ, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হতো। তাছাড়া ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হয়।

সামাজিক কাঠামো

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো চৈনিক সভ্যতায়ও সামাজিক বৈষম্য ছিল। সমাজে অনেক দাস ছিল। তাদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সরকারিভাবে গবাদি পশু আর দাসদের একই তালিকায় রাখা হতো। চীনা পরিভাষায় এদের 'এ্যানিমেল ম্যান' বলা হতো।

সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল সমাজে সবেচেয়ে নিচু স্তরে। ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ব্যবধান ছিল আকাশ-পাতাল। সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থাকায় মেয়েদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান

চৌ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এযুগের লেখা অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেছে। চৌ আমলে হাতের লেখার প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং এ সময় নথিপত্র সংরক্ষণের কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। চৌ যুগের শেষ দিকে ইতিহাস, সংগীত, আচার-অনুষ্ঠান, তোরণ নির্মাণ, কবিতা সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বহু বই পুস্তক লেখা হয়।

ধর্ম

চৌ যুগের লোকেরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করতো। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তিয়েন। মাটিকে মনে করা হতো কৃষির দেবতা। চৌ যুগেও পূর্ব পুরুষের পূজার প্রচলন ছিল। এ যুগেই চিনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

চিনের প্রাচীর

চিনের মহা প্রাচীর নির্মিত হয় চৌ-রাজ বংশের আমলে। রাজা শি-হুয়াং তি এই প্রাচীর তৈরি করেন। হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল এখন তা বিশ্বের আশ্চর্য বস্তুর একটি। দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীরের উচ্চতা গড়ে ২৪ ফুট। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারতো।

চিনের মহাপ্রাচীর

দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান

দর্শন বিদ্যায় চিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। চৌ-রাজাদের আমলে একটি শিক্ষিত নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। দার্শনিকরা ছিল এই শ্রেণিভুক্ত। চিনের প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে (খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪-৫১৭) তার চিন্তা চিনা জীবন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে এবং অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করে রেখে ছিল। তিনি বিশ্বসভ্যতায় এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী দর্শন উপহার দেন। কনফুসিয়াসের সময় চিনের সমাজ জীবন খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তিনি চিনের যুবকদের শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দর্শনের একটির স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কনফুসিয়াসের দর্শন খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে চিনে ধর্মে পরিণত হয়। কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশেও তাঁর দার্শনিক চিন্তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চিনের অন্যান্য খ্যতনামা দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন জেনসিয়াস ও মোতি।

কনফুসিয়াস

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	১. 'পিকিং মানুষ' কী? কী করে এরা সভ্যজাতিতে পরিণত হয়? লিখে দেখান। ২. কী কী বিষয় চীনা সভ্যতাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে? একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

চিন সভ্যতা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শাং এবং চৌদের আমলে চিনের সমাজ-অর্থনীতি-সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে লাঙ্গলে লোহার ফলা ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। প্রকৃতি পূজা থেকে তারা ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়। কনফুসিয়াসের দর্শন ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হয়। ঐ সময় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। চিনা সিল্ক, চিনা মাটির পাত্র, চিনের মহাপ্রাচীর সব কিছু চিনা সভ্যতাকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই?
ক) গ্রিক খ) মিশরীয়
গ) সিন্ধু ঘ) চিন

২। চিনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো–
ক) জমিতে সার প্রয়োগ করে খ) ট্রাক্টর ব্যবহার করে
গ) লোহার ফলাযুক্ত লাঙল ব্যবহার করে ঘ) বাধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে

৩। চিনে সিল্ক কেন রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়?
i) গুটি পোকার সূতা থেকে মসৃণ কাপড় তৈরির কারণে
ii) রেশমী সূতা তৈরির মাধ্যমে
iii) উন্নত ডিজাইন ব্যবহার করে।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৪। চিনা যুবকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কনফুসিয়াস কী প্রতিষ্ঠা করেন?
ক) ব্যায়ামাগার খ) অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
গ) দর্শনের বিদ্যালয় ঘ) বিজ্ঞান গবেষণাগার

৫। "এ্যানিমেল ম্যান" কাদের বলা হতো?
ক) কৃষকদের খ) দাসদের
গ) বণিকদের ঘ) তাঁতীদের

পাঠ-২.৫ গ্রিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মহাকাব্য, হেলাস, হেলেনীয় সংস্কৃতি, নগররাষ্ট্র, দাস, সফিস্ট, পৃথিবীর মানচিত্র, বাদ্যযন্ত্র, অলিম্পিক ক্রিড়া

পটভূমিঃ গ্রিসের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। উনিশ শতকের শেষে হোমারের কাহিনী আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সত্য ইতিহাস। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় এক উন্নততর প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংস স্তুপের। ইউরোপ মহাদেশের এই অঞ্চলেই প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

মহাকবি হোমার

ভৌগোলিক অবস্থা ও সময়কাল

গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূ-মধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলকান উপদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে একটি ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। গ্রিস মূলত একটি পর্বতময় দ্বীপ রাষ্ট্র। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতকে। গ্রিকরা ৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান

গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল হেলাস। রোমানরা পরবর্তিকালে এর নামকরণ করে গ্রিস। গ্রিক সংস্কৃতি হেলেনীয় সংস্কৃতি নামে বেশি পরিচিত। অসংখ্য নগররাষ্ট্র নিয়ে গড়ে উঠা প্রাচীন গ্রিসে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা এবং গণতন্ত্র চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল এথেন্স। নিম্নে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষাঃ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া। স্বাধীন গ্রিসবাসির ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। ধনি ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। মেয়েরা কোনো প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারত না। দাসদের সন্তানের জন্যও বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণিরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাদের কারো কারো মতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করতেন– সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত এবং সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সাহিত্যঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানব সমাজের মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' মহাকাব্যের অপূর্ব নিদর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রিক প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। 'এসকাইলাস'কে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তার রচিত বিখ্যাত দুটি নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড' ও 'আগামেমন'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তার বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা 'অয়দিপাউস', 'আন্তিগোনে' ও 'ইলেকট্রা' অন্যতম। আর এক বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ইতিহাস রচনা শুরুই করে গ্রিকরা। হেরোডোটাস প্রথম ইতিহাস রচনা শুরু করেন বলে তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত ইতিহাস সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডিস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়ার'।

ধর্মঃ গ্রিকদের বারটি দেব-দেবী ছিল। এছাড়াও তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিলেন দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এখনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বার

জনের মধ্যে এই চার জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

দর্শন: দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্য গ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট। এরা বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্সের রাজা পেরিক্লিস এদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ চিন্তার দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল- আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

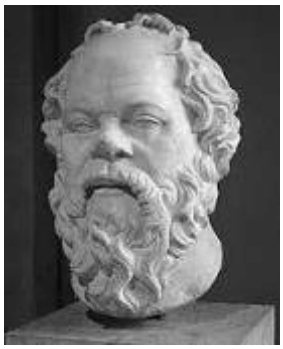
সক্রেটিস

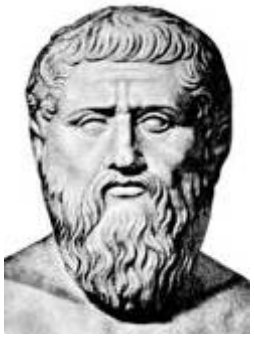
প্লেটো

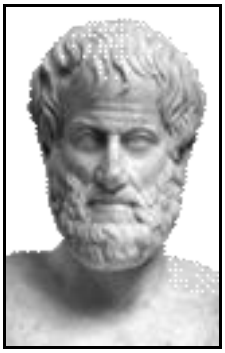
এরিস্টটল

ইউক্লিড

পিথাগোরস

বিজ্ঞান: গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞান চর্চা শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অংকন করেন গ্রিক বিজ্ঞানিরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয় প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতি বিষয়ে পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্র শিল্পের নিদর্শন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। এসব প্রাসাদের স্তম্ভগুলো অপূর্ব কারুকার্যখচিত থাকত। পার্থেনন মন্দির, দেবী এথেনার মন্দির গ্রিক স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস। এদের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন ফিদিয়াস। তিনি তার অপূর্ব দক্ষতায় গড়ে তুলে ছিলেন ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তি।

সঙ্গীত চর্চায়ও গ্রিকদের উৎসাহ ও দক্ষতার অভাব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে গান গাওয়ার জন্য সঙ্গীত চর্চা করতে যেয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নতুন নতুন বাধ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

খেলাধূলা: গ্রিসে শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়গুলো ছিল তাদের খেলাধুলা শুরুর স্থান। গ্রিকদের শরীরচর্চার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিতো। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে অলিম্পিক খেলা শুরু হয়। প্রতি চার বছর পর পর এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিতো। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত নগর রাষ্ট্রগুলোতে তখন শান্তি বিরাজ করত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে।

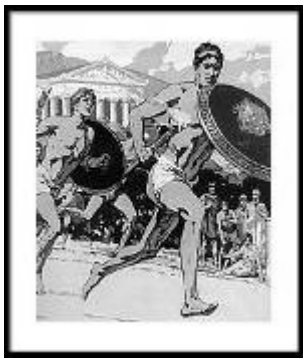
অলিম্পিক খেলা

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত মণীষীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন। ২. যে দুটি মহাকাব্যের কাহিনীর কারণে গ্রিক সভ্যতার সন্ধান সে কাব্য দুটি এবং এর লেখকের নাম কি?

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। এই হেলেনীয় সংস্কৃতির দাবীদাররা শুধু ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত, খেলাধূলা চর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা?
ক) মিশরীয় বিজ্ঞানীরা খ) গ্রিক বিজ্ঞানীরা গ) সিন্ধুসভ্যতার ব্যবসায়ীরা ঘ) রোমান ভূগোলবিদরা

২। এথেন্সের জনগণ–
i) সামরিক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত ছিল ii) গণতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল
iii) রাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৩। হোমারের মহাকাব্য হিসেবে সমর্থনযোগ্য (প্রয়োগমূলক)
i) দ্যা পেলোপনেসিয়ান ওয়ার ii) ইলিয়ড iii) ওডিসি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন–

জমিদার আরমান শাহ্‌র জমিদারিতে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সন্তানদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো এবং কারিগর ও কৃষকদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু দাস দাসীর সন্তানদের এবং সমাজের মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারতো না।

৪। উদ্দীপকে শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কোন সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক) গ্রিক খ) মিশরীয় গ) ফিনিসীয় ঘ) সিন্ধু

৫। উক্ত সভ্যতায় কার হাতে শাসনভার অর্পণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত?
ক) ধর্মীয় গুরু/পুরোহিতের নিকট খ) দার্শনিকের হাতে
গ) সুশিক্ষিত নাগরিকের কাছে ঘ) গণিতশাস্ত্রবিদের কাছে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. গ